দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 08.OCT 1995.. ...

পৃঃ ... কলাম ... ৭......

ভর্তি সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শহিদুল ইসলাম

(শেষাংশ)

সরকারের এ নতুন সিদ্ধান্তের প্রতি কিছু দ্বিমতেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তা অস্বাভাবিক নয়। সেসব দ্বিমতের পিছনে যে শক্ত যুক্তি আছে, সরকার যদি সেগুলো অস্বীকার করে, তাহলে ভুল করবে। সে সম্পর্কে সরকারও অবহিত, ১১ নম্বর সিদ্ধান্তই তার প্রমাণ। তাই সরকারের এই নতুন সিদ্ধান্তের প্রতি দ্বিমত পোষণকারীদের যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েই সে ব্যবস্থা চালু করতে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে মনে হয়। তা না হলে দেখা যাবে সরকার যেসব মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করল, তার কোনটিই বাস্তবায়িত না হয়ে ভিন্নমত পোষণকারীদের একটি যুক্তিই প্রবল হয়ে সরকারের সব সদিচ্ছাকেই গুড়িয়ে দিয়েছে। সরকারের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তার অনুগত কিছু 'বিশেষজ্ঞ' ও 'শিক্ষাবিদের' পরামর্শক্রমে শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়েই এসএসসিতে 'প্রশ্নব্যাংক' চালু করা হয়েছিল। সরকারের উচিত ছিল ১১ নম্বর সিদ্ধান্ত প্রথমে নেয়া এবং তা কার্যকর করার পরই এই নতুন ভর্তি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে অগ্রসর হওয়া। পত্রপত্রিকায় নতুন ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বড় বড় নামীদামী স্কুল–কলেজপ্রধানের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত সমর্থন করেও কেউ কেউ 'তবে' 'কিন্তু'র কথা বলেছেন, সেগুলো মোটেই গুরুত্বহীন নয়। ভিন্নমত পোষণকারীদের বক্তব্যে তিনটি প্রধান দিক বেরিয়ে এসেছে ঃ

১. ভর্তি ফরম বিক্রির আয় থেকে বঞ্চিত হয়ে বেসরকারি এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে,

২. ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, গভর্নিং বডির সদস্যসহ অনেক লোক জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে সময় নিয়ে তা করা দরকার ছিল, যাতে সবার সঙ্গে আলাপ–আলোচনা করার সুযোগ থাকতো,

৩. মফস্বল থেকে অনেক বেশি নম্বর নিয়ে আসা ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ বেশি পাবে। ঢাকার ভাল ছাত্রছাত্রীরা সে সুযোগ পাবে না।

আপত্তির প্রথম কারণটি কোন ব্যাপারই নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ দুটোর গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় বক্তব্যে বক্তারা ধীরে চলার নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী। নতুন পদ্ধতি চালু করার আগে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। তাদের এ সাবধানী মনোভাব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে মঙ্গলকর। ধীরে সুস্থে, চিন্তা–ভাবনা করে, বিভিন্ন লোকজনের পরামর্শক্রমে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যে ভাল সে কথা সবাই স্বীকার করবেন। শিক্ষা কাঠামো, পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের আগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত স্কুল–কলেজ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র অভিভাবকদের মতামত গ্রহণের বিকল্প কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। আইভরি টাওয়ারের চূড়োয় বসে আমলাতান্ত্রিক কোন সিদ্ধান্তই দেশের মঙ্গল বহন করে আনতে পারে না। যারা মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করছেন এবং তা উত্তরণ করছেন, তাদের মূল্যবান মতামত গ্রহণ না করা জাতির জন্য দুর্যোগ ডেকে আনতে পারে, যেমন ডেকে এনেছিল 'প্রশ্নব্যাংক' চালু করে।

তিন নম্বর যুক্তির পিছনে বক্তারা কোন কারণের উল্লেখ না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মফস্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণের সময় যে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত নকল হয়, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটু পিছনের দিকে তাকানো যেতে পারে। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি নিদারুণ অবিশ্বাস থেকেই কিন্তু সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে পাবলিক পরীক্ষার পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষা নামের এই বিকল্প বিরাট পরীক্ষা প্রক্রিয়াটি গড়ে ওঠে। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি অবিশ্বাস ও অবহেলা কেবল অনৈতিক ও অযৌক্তিকই নয়, তা আমাদের ব্যর্থতা ও লজ্জার বিরাট প্রমাণ। আমরা ঐসব পরীক্ষা ঠিকমত নিতে পারিনি। নকলবাজির ঘূর্ণিঝড়ে সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। কেবল তখনই এই কেন্দ্রীভূত ভর্তি পরীক্ষা সংগঠনটি গড়ে ওঠে। আজ যখন সরকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ছাত্র ভর্তির জন্য তাদের বাছাই করার অধিকার হরণ করে কেবল পাবলিক পরীক্ষাসমূহে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে তখন এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে আমাদের পাবলিক পরীক্ষাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে? পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রদের নকলবাজি, শিক্ষক–কর্মচারী–কর্মকর্তা–প্রশাসনের দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে এটা কেউই বিশ্বাস করে না। যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির ব্যবস্থা হলে ভাল ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য অশুভ ফল বহন করে আনতে পারে, সে আশংকা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বক্তারা সম্ভবত একথাই বলতে চেয়েছেন। তবে রাজধানীর যারা মফস্বলের নকলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও নকল নামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত। একটি বিরাট ঐতিহ্যবাহী পুরনো কলেজে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের জন্য আলাদা পরীক্ষা ঘরের ব্যবস্থার কথা দেশবাসী ভুলে যায়নি। সেখানে পরিদর্শকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই বলছিলাম, একে–ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করার সৎসাহস সবারই থাকা উচিত। ঢাকার নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে সেখানকার শিক্ষকরাও কম উদ্বিগ্ন নন। তাই আগে পাবলিক পরীক্ষাসমূহে ব্যাপক নকলবাজি বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল না কি? নকলের কারণগুলো দূর করার কড়া পদক্ষেপ নিলে জনগণ সর্বান্তকরণে সমর্থন দিত। 'ছাত্ররা নকলবাজ' কথাটি এভাবে বললে ভুল হবে। নকলের জন্যে কেবল ছাত্ররা দায়ী নয়– শিক্ষকরা দায়ী, অভিভাবকগণ দায়ী, নকল প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকারি প্রশাসন দায়ী। মফস্বলের স্কুল– কলেজগুলোতে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ টাকার ব্যাগ নিয়ে স্থানীয় সরকারি প্রশাসন থেকে শুরু করে বোর্ড–বিশ্ববিদ্যালয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন কেন? সে টাকাগুলো কোন্ গহ্বরে যায়? তারাই বা কেন টাকার ব্যাগ হাতে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এত ব্যগ্র হন? নকল প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের প্রধানের কাছে কোন এক নিঃসঙ্গ মুহূর্তে যে খামটি পৌঁছে যায় কিংবা পরিদর্শনে এলে হেডমাষ্টার বা অধ্যক্ষের ঘরে চা–নাস্তা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে খামটি তাকে ধরিয়ে দেয়া হয়, তা কি জন্যে? পরীক্ষার পর এক শ্রেণীর অভিভাবকের খাতার পিছনে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয় কেন? অর্থাৎ পরীক্ষায় নকলের কারণ অনুসন্ধানে সরকার যদি একটি কমিশন নিয়োগ করে তাহলে দেখা যাবে এককভাবে কোন একটি গোষ্ঠীকে দায়ী করা যাবে না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এর সঙ্গে জড়িত। এটি একটি জাতীয় ব্যাধি। সরকার কেবল 'পাবলিক পরীক্ষাসমূহকে আরো উন্নত, সুষ্ঠু, বস্তুনিষ্ঠ ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দেয়ার সুপারিশ' করলেই যে ঐসব লক্ষ্য অর্জিত হবে, এ আশা নিয়ে বসে থাকলে সরকারের মুখে আবারও চুনকালি পড়তে বাধ্য। যেমন চুনকালি পড়েছে 'প্রশ্নব্যাংক' চালু করে।

দেখা যাক সরকারি এ সিদ্ধান্তে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ভোরের কাগজের প্রতিবেদক জানান যে, সরকারের এ সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের সমর্থন পেলেও 'মহলবিশেষ' এর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার–আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদক জানান যে, কোচিং সেন্টার ও বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের দিয়ে এ আন্দোলন চালাচ্ছে। এ আন্দোলনে শিক্ষকদেরও জড়িত থাকার ইঙ্গিত রয়েছে ঐ প্রতিবেদনে। 'সরকার ঐ শিক্ষক এবং তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে' বলে জানা যায়। তাহলে দৈনিক 'সংবাদ'–এ ২০শে আগস্টের প্রতিবেদনটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে কোচিং সেন্টারগুলো এবং তদবির ও কোটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে বলে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দ মনে করেন। 'সংবাদ'–এর উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ, তদবির ও কোটা বরাদ্দের সিংহভাগই পায় সরকারি ছাত্রদল। ফলে তা বিভিন্ন কলেজে সরকারি ছাত্র সংগঠনের অবস্থান সুদৃঢ় হতে সাহায্য করে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারছে কেন। এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের পেতেই হবে। আসলেই কোচিং সেন্টারগুলো ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ যা আশংকা করছে, তা কি সত্যি? সত্যি কি ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করে পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা করলে সবাই যা আশা করছে, তার বাস্তবায়ন হবে? সত্যি কি কোচিং সেন্টারগুলোর ব্যবসা বন্ধ ও ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে ভর্তিব্যবস্থা মুক্ত হবে? ভর্তির ব্যাপারে বিভিন্ন চাপ থেকে কলেজগুলো রেহাই পাবে? 'কিছু ভাল ছাত্র,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নীতি

কয়েকদিন পূর্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ ১৯৯৪–৯৫ সেশনে মাষ্টার্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ভর্তির যোগ্যতা হিসাবে চাওয়া হয়েছে ন্যূনতম ৬ পয়েন্টসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪৫% এবং বাংলা ও ইংরাজী বিষয়ে যথাক্রমে ৫০% ও ৪৫%। আমাদের জানার বিষয় হলো, এটা কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত নিয়ম? নাকি ঐ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নিয়ম? যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম হয়ে থাকে তবে আমাদের কিছু কথা আছে। ১–এর পরে ২ সবাই জানেন, ২–এর পরে ৩। ঠিক তেমনি SSC–এর পরে HSC–এর পরে ডিগ্রী এবং তার পরে মাষ্টার্স। এই নিয়মে কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। পৃথিবীর কোন দেশেই তা করা হয় না এবং করার নিয়ম নেই। এমন নিয়ম নেই।

অনেক ছাত্রছাত্রী আছে, যাদের সংগ্রহে ৬ পয়েন্ট নেই। কিন্তু তাদের কি মাষ্টার্স পড়ার অধিকার নেই? ঢাকার মত একটি অভিজনবহুল রাজধানী শহরে যেখানে শিক্ষিতের হার অনেক বেশী সেখানে মাষ্টার্স পড়ার জায়গা খুবই সীমিত। মাত্র ২/৩টি প্রতিষ্ঠানে সে সুযোগ আছে। সুতরাং ভর্তির এত কড়া নিয়ম অবিলম্বে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে মাষ্টার্সে পয়েন্ট করা না গেলেও অন্তত ৫ করা যেতে পারে। তাছাড়া, ১৯৯৪ সালে যারা ডিগ্রী পাস করেছে, তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে পাস করেছে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম প্রয়োগ করাও ঠিক হবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও ১৯৯৪ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা নিয়েছে। ১৯৯৫ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ভর্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি না করে যথাসম্ভব তা শিথিল করুন। তা করুন অন্তত ১৯৯৪ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার্থীদের জন্য। তাছাড়া, একটা নতুন নিয়ম চালু করতে হলে অনেক পূর্বেই তা প্রকাশ করা উচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না, যাদের ৫ পয়েন্ট আছে অথচ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভর্তির যোগ্য, তারা ৫০/৫৫% নম্বর পেয়েও যদি ভর্তি হতে না পারে, তবে তাদের জীবনে নেমে আসবে চরম হতাশা। তেমন অবস্থায় নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়াও তাদের অনেকের পক্ষে খুব এটা অস্বাভাবিক হবে না।

তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন এটাই তাদের কাছে প্রত্যাশ্যা।

– জুয়েল, রানা, শুভ্রা, মুরাদ, রুনা, নাজমা, সায়াদ, মামুন, বীথি, মিথা। সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা